প্রকাশকাল

শ্রীপঞ্চমী, ১৩৬৭

প্রকাশক

বিশ শতক প্রকাশনীর পক্ষে

বনানী সেন

৫২ নন্দনা পার্ক, কলিকাতা-৩৭

ফোন : ৪৫-৮২৯৬

প্রচ্ছদশিল্পী

শ্রীবঙ্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রক

শ্রীঅপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

গ্রন্থপরিক্রমা প্রেস

৩০/১ বি, কলেজ রো

কলিকাতা ৯

সূচীপত্র

উৎসর্গ

সহধর্মিণী উমাকে

খালি জমিটাকে নিয়ে
মন কষাকষি আর কথা কাটাকাটি।

আমি চাইলাম,
টগর, গোলাপ আর ক্রিসিনথিমাম,
দু-রঙা বোগনভিলা, পর্টুলেখা দিয়ে
জমিটাকে তুলবো সাজিয়ে!
আর তুমি, ধরে আছো জিদ্ :
রসনার তাগিদে এ-ভূমি
বেগুন পালংশাক দিক্।
ঢ্যাঁড়স, পেঁয়াজকলি, লিচু,
ধানিলঙ্কাও কিছু
রঙচঙা নোলকের মতো
ঝুলুক না ডালে ডালে!
জীবনটা টকে-ঝালে
কেটে যাক্ রন্ধনশালায়।

ভিন্ন মত, পৃথক সংহিতা !
পুঁতে দিয়ে চারা রাংচিতা
আমরা দু'জন তবু সীমানা চিহ্নিত করি
ফালি জমিটার।
একদিন করি আবিষ্কার,
মাটির সংসার ঘিরে কি নিশ্চিন্ত এই পরিসীমা
এঁকে দিল রাংচিতা যত।
যৌবনভারাবনত দুগ্ধ-উথল দেহ
কি লাবণ্যমাখা।
মাথায় লালের ছোপ, সাবিত্রীর সিঁথি।

এ-জমি আমিই যেন।
আমাকে বেষ্টন করে রাংচিতাদের
মধুর গৃহিনীপণা, বড় প্রয়োজন !

শুভ্রশেখর মজুমদার

রাংচিতার বেড়া

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

এই কবিতা সংকলনের কাজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য-সমালোচক অধ্যাপক ডঃ ভবতোষ দত্ত ও কবি সন্তোষ কুমার অধিকারীর কাছে গ্রন্থকার বিশেষ ঋণী

জন্মদিন

আজ আমার জন্মদিন !
বারবার আপনার পানে
চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি :
সেই জন্মদিবসের সদ্যফোটা সে-শিশু কোথায় !
কপালে অজস্ররেখা,
কালোছায়া দুচোখের নিচে ;
অধুনাবিলুপ্ত কোনো অজানা হরফে
একদা-উৎকীর্ণ-করা অর্থময় সূক্ত তারা জানি ;
পাঠোদ্ধার হবে তার আমি যবে জীবন-সন্ধানী !

আজ আমার জন্মদিন !
আশ্চর্য পুলকে আমি পুনরায় বীজ হয়ে যাবো
অরণ্যসম্ভব ।
আবার লভিব ঠাঁই অন্ধকার মৃত্তিকার দেশে,
সেখানে ভ্রূণের ঘুম নিশ্চিন্ত আবেশে ।

নাভিতে নভের স্বাদ ;
আমি অকস্মাৎ
জীবনের যন্ত্রণায় মৃত্তিকা বিদীর্ণ করে, রক্তাক্ত কান্নায়
আবার ভূমিষ্ঠ হবো
প্রকৃতির প্রসূতিশালায় ।
সে-এক সকাল !
পাখী দেবে উলুধ্বনি, আশীর্বাদ দেবে সূর্যশিখা,
সুধাস্তন জননী বসুধা
সানন্দ যন্ত্রণাশেষে মোরে দেবে অজস্র চুম্বন ।

আজ আমার জন্মদিন। ঠাঁই লভিয়াছি
সবুজের সংসারের বড় কাছাকাছি।
শিকড়ের ওষ্ঠ দিয়ে বুকভ'রে সুধারস টানি,
দিনে—রাত্রে, আলোকে-আঁধারে,
রৌদ্রে, শিশিরে আর শ্রাবণের প্লাবনধারায়
আমি শুনিয়াছি
ঋতুভাষ আকাশের বাণী।
পাতালের সেই আমি
বিকাশের—বিস্তারের মাতাল নেশায়
মেলিয়াছি পাখা ঊর্ধলোকে!
কতো নীড় গড়া-ভাঙা, কতো হাসিকান্না আর শোকে
পল্লবিত শাখা—প্রশাখায়
এই আমি লিখি ইতিহাস।

আজ আমার জন্মদিন: মৃত্যু নেয় সেখানে নিঃশ্বাস।

চিরায়ত সাহিত্য

মহাকালের সঙ্গে সমান্তরালে
একটা নদী বয়ে চলেছে অনন্তকাল।
সাহিত্য তার নাম। রসনদী চিরবহমতী।
জন্ম-মৃত্যু দুই তীর সম-শ্যামলিমা :
ভাঙা-গড়া, বহমতী জীবনের স্রোত।
মাঝখানে জোড়াসাঁকো
এপারে-ওপারে সংযোগ।

সে-যোগ নিত্য আনাগোনার।
মিলনের-বিরহের, অমৃতের-গরলের,
মানুষের ভালোমন্দ,
ভালোবাসা, ঘৃণা, সম্প্রীতিরও।
মানুষ এক সাঁকো দিয়ে যায়,
আর-এক সাঁকো দিয়ে আসে,
এই যাওয়া-আর-আসা,
আসা-আর-যাওয়া .....
শুরু আর শেষের কবিতা
চিরসত্য, চিরনিত্য ;
'পঁচিশে বৈশাখ' থেকে 'বাইশে শ্রাবণ'।

অফিসগামিনী বধূকে

ছুটে চলে ট্রাম, কেরাণী-বোঝাই ট্রাম।
আমিও চলেছি নাকে-মুখে কিছু গুঁজে ;
প্রাণটার চেয়ে সময়ের বেশী দাম,
চলন্ত ট্রামে লাফিয়েছি চোখ বুজে।

ট্রামের চাকাতে ঘড়ির কাঁটাতে রেস ;
পথ 'জ্যাম' হলে কেরাণীরা করে রাগ।
লালদীঘি লাখো দাসানুদাসের দেশ ;
বড়বাবু দেবে লেট্ হলে লাল দাগ !

চোখ বাঁধা পড়ে ওপাশে লেডিজ্ সিটে,
লাল দাগ, আহা টক্‌টকে লাল সিঁথি !
শিথিল কবরী আল্‌তো ঝোলানো পিঠে,
তুমিও অফিস যাও কি যুবতী নিতি ?

কেরাণী হয়েছো, আহা তুমি কার রাণী
জানালার ধারে হেলানো ক্লান্ত গ্রীবা ;
কাজ্‌লা দুচোখে ঘুম করে কানাকানি
আঁখিপল্লব মানে না, এখন দিবা !

ট্রামের দোলন আনে ঘুমঘুম নেশা,
হয়নিকো বুঝি একটুও ঘুম রাতে ?
জোর করে টেনে এনেছে কলম-পেশা,
হয়নি সময়, তেল পড়েনিকো মাথে !

কালকে ছিল কি পুণ্য বিবাহ-তিথি ?
স্বামী-দেবতার সোহাগ উথ্‌লে উঠে
গেয়েছে কেবল অবাধ্য কামগীতি,
বড় জ্বালাতন করেছে অধরপুটে ?

অথবা, তোমার অভাবের নাগিণীরা
ছোবল মেরেছে বিষাক্ত ফণা তুলে,
শত চিন্তায় হিম হয়েছিল শিরা,
চোখের পাতারা ঘুম গিয়েছিল ভুলে ?

কিংবা কোলের ফুটফুটে কচি ছেলে
সারারাত ধরে করে গেছে দুষ্টুমি ;
হাসিকান্নার এমন স্বর্গ ফেলে
কেউ কি ঘুমোয়? কেন বা ঘুমোবে তুমি?

এখন কোথায় বিছিয়ে আঁচলখানি
ঘরের মেঝেয় এলাবে ক্লান্তদেহ,
স্তনসুধা দেবে কোলের ছেলেকে টানি,
তা নয়, এখন ঘরণী ছাড়িলে গেহ।

লক্ষ্মী চলেছো লালদীঘি অভিমুখে !
না-গেলে হয় না দুটো খেয়ে-পরে বাঁচা,
কি যে অনিচ্ছা দেখছি ত' চোখে-মুখে ;
সোনার হলেও কার ভালো লাগে খাঁচা ?

ঋতুর প্রথম বৃষ্টি

কানে আর খোঁপায়
থোকা-থোকা ফুল দিয়ে সাজ-সারা
পাহাড়ীয়া ষোড়শীর মতো,
আমার বারান্দা-নির্ভর—
একান্ত আমারই বোগনভিলা
'প্রবিকীর্ণকামা বিকীর্ণমন্মথা পুংশ্চলী'র মতো
উদ্ভিন্নযৌবনের মহুয়া নেশায়,
উদ্ধতপুরুষ ঐ কালবোশেখী-ঝড়ের সঙ্গে
জড়াজড়ি হুড়োহুড়ি করতে করতে
হুড়মুড়িয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।
এহেন দ্বিচারিণীকে
টেনে তুলে বাবান্দায় পুনর্বাসন ?
সংবেদন দূরে থাক,
আমি রাগে, ক্ষোভে,
ধারালো অস্ত্রের ঘায়ে কোপ মেরে মেরে
তার যৌবনের সমস্ত গর্বকে খণ্ডিত করলাম :
যৌবনের তীক্ষ্ণকণ্টক দিয়ে
সে আমায় বিক্ষত করলো বটে বারবার,
কিন্তু তবুও আমি নিরস্ত হইনি।
অথচ,
সুদূরের সুন্দর আকাশটা এই দৃশ্য দেখে
থম্‌থমে হয় গেল !
তারপর সেই অকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়লো অজস্রধারায়।

ঋতুর প্রথমবৃষ্টি সেটা !

প্রেম

এমনও ত' হয়!
দেহটা সম্ভোগরত; হৃদয় তখন
উদাসীন, তীর্থযাত্রি।
বিগলিত অশ্রু দু'নয়নে।
ধুলো-কাদা ঝড়-বৃষ্টি অঙ্গে মেখে পরিব্রাজক,
পদযাত্রা কোন্ এক বিরহের মন্দিরাভিমুখে
যেখানে বিগ্রহ তার প্রেয়সীরই কমনীয় তনু,
অথচ, অতনু প্রেমাভাসে।

এ-দেহে আশ্রয়লাভ, তবু নয় তার ক্রীতদাস।
এখানে মিথুন লগ্ন, ওখানেতে তখন সন্ন্যাস।

দূরাগত সঙ্গীত

শোনায়নি ওরা কেউ দূরাগত সঙ্গীতের ধ্বনি।

কেগো তুমি এলে অকস্মাৎ?
দুঠোঁটে কামুক রঙ, দুই চোখে ছলনাকাজল
নেই দেখি!
অতি সাধারণ!
আমার অঙ্গন হলে পার। পায়ে পায়ে চলমন্তী সুর।
ওদেহে লুকানো বুঝি ছোট এক ট্রানজিস্‌টার!
হৃদয়ের গুপ্ত কোন্‌ আকাশবাণীর
নির্ধারিত শিল্পী সেই সেতারীর সুরেলা প্রোগ্রাম
চুম্বকী কাঁটায় তুমি ধরেছো নির্ভুল?
রিমঝিম্‌ তারই রেশ
ভরে দিলো আমার অঙ্গন।
আজ যা পেলাম,
প্রেম তার অন্য নাম বুঝি!

শুক্লা-চতুর্দশী

দেওয়াল-পঞ্জি ! আজকে কি যেন্ তিথি ?
তুমি না লিখেছো শুক্লা-চতুর্দশী ?
মেঘবিষণ্ন আকাশে কিন্তু, একি !
থম্‌থমে গাঢ় কৃষ্ণপক্ষ লেখা ?

কোন্‌টা সত্যি ?

দীপ জ্বালাতেই দেখি,
স্বপ্নশিথিল আমার প্রিয়ার সহাশান্ত মুখে,
আহা ! কতো চাপা বেদনাকরুণ রেখা !
অনুতাপে তার তপ্ত ললাটে ধীরে,
যেই, দিয়েছি অধর-ছোঁয়া—
দেখি, মেঘকজ্জল নয়ন পেরিয়ে নামলো আচম্বিতে
জল-চিক্‌চিক্ জোছনার মতো একমুঠো মিঠে হাসি
তৃপ্তিস্মিত ; প্রিয়ার অধর-তীরে।

মেঘের আড়ালে মিথ্যা হয় না শশী।
দেওয়াল-পঞ্জি ! তোমার কথাই ঠিক :
আজকের তিথি, শুক্লা-চতুর্দশী !

সে-এক বরষা

সখি ! সে-এক বরষা
দারুণ করুণ বরষা
নেমেছিল বটে আমার আকাশে
সেই যৌবনকালে !
সে-এক শ্রাবণ আমারই জীবনে এসে,
মেঘে মেঘে দিলো বিশাল আকাশ ছেয়ে :
সে-এক দহনে মরিলাম ভালোবেসে,
সে-এক বরষা নামিল নয়ন বেয়ে ।
তেমন বরষা,
তেমন ব্যাকুল বরষা,
দেখিবি না সখি এই পৃথিবীতে,
কোনদিন কোনো কালে !
ঝরঝরঝর শুধুই অঝোরধারা !
ছিলনা ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ হানাহানি,
দয়িত-বিরহে অপলক আঁখিতারা,
থৈথৈ জল কান্নায় কানাকানি !
সখি ! সে-এক বরষা
ব্যাকুল প্রবল বরষা
নেমেছিল বটে আমার আঁখিতে
সেই যৌবনকালে !
শুধাস্ আদিম আকাশকে, ওলো সখি !
কোটি বছরেও ওর ঐ নীল-লোকে
এমন বিধুর বরষণ নেমেছে কি,
যে-বিধুর ধারা নেমেছিল মোর চোখে ?

মাঝরাতের বৃষ্টি

গতরাত্রে
সেই দুষ্টু মেয়েটা এসেছিলো!
এসেছিলো
সেই মিষ্টি মেয়েটা, যার ডাক নাম বৃষ্টি।
লঘুছন্দে পা টিপে টিপে,
টুপ্‌টাপ্‌, টুপ্‌টাপ্‌
রুদ্ধ জানালার ঘষা-শার্শিতে মৃদু টোকা মেরে
নিশ্চয় দেখেছিলো কিশোরী মেয়েটা,
এই প্রৌঢ়
প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ কিনা!

সকালে দেখেছি জেগে জানালার শার্শিতে তার জলছাপ
নিদারুণ অনুতাপ,
কেন ঘুম ভাঙেনি আমার!
রাতভোর দুষ্টুমি, রিম্‌ঝিম্‌ গান
কেন শুনিনিকো!

টানটান্‌ মশারীর চার-দেওয়ালেতে,
ঘুমের বড়িটা গিলে এ-আমি তখন
নিদ্রায় বুঁদ।
মেদময় জীবনটা শয্যাসঙ্গিনী।
মিষ্টি মেয়েটা দেখি সারারাত ধরে
আশেপাশে খেলা করে গেছে।
নিম, জুঁই, নারকেল,
শুকনো শিউলি ডাল,

আমার বোগনভিলা তিন-রঙা ফুলে ফুলে,
সব গাছে-গাছে তার দুষ্টুমির ছাপ রেখে গেছে।
দেখেছি ভোরের রোদে
নিটোল জলের ফোঁটা ঘাসে গাছে চতুর্দিকে,
যেন গোলকুণ্ডার খনি।
জড়োয়ার অলংকার
কিশোরীটা ফেলে-ছড়ে গেছে অবহেলে।
টিক্‌লি, কানের দুল,
নুপুর বা নাকছাবি,
যেখানে যা হীরে মণি মুক্তো পান্না ছিল,
—সব ফেলে গেছে!

কি করি এখন আমি নিয়ে এই কুবের বৈভব?
মেয়েটা যে রাগ করে গেছে!
কেন আমি জাগিনিকো টুপ্‌টাপ্‌ তার টোকা শুনে!

ছাতিম ফুল

কোথায় তুমি ? তোমার কথা ভাবি,
স্মৃতির কাছে প্রেমের যত দাবি !
বিবহীমন সে যেন কোন্ মৃগ,
কেমনে পায়ে শিকল তার দি গো ?
আকুল করে এ কোন্ মৃগনাভি ?

পড়িছে মনে, সুধার সুরে তুমি
শুধায়েছিলে অধরখানি চুমি ঃ
"সহসা যদি জীবন-নদী মম
শুকায়ে যায়, বলো ত' প্রিয়তম !
জীবন তব হবে কি মরুভূমি ?"

সোহাগমাখা সে-এক বিদ্রূপে,
শুধায়েছিলে সেদিন চুপে চুপে ঃ
"সহসা যদি জীবনদীপ নেভে,
আমারে চিরচিতায় তুলে দেবে ?
অথবা ফিরে চাহিবে আর-রূপে ?

আসবো না গো সমাজ-বন্ধনে,
কামুক-দেহে বাঁধা শামুক-মনে।
হয়তো মোর নবজনম হবে
নাম-না-জানা ফুলের সৌরভে ;
পারো ত' খুঁজে নিয়োগো সমীরণে" !

পৃথিবী ভরে ফুটলো ফুল নানা।
বিরহী মন, প্রজাপতির ডানা!
খুঁজলো কতো, কোথায় তুমি চুপে
লুকিয়ে আছো, কোন সুরভি-রূপে,
কেমনে হবে তোমারে কাছে আনা?

আশ্বিনের বৃষ্টিজলে ভিজে
ছাতিমফুল ছড়ালো ঘ্রাণ কিযে!
সে যেন এক বিলাসী নর্তকী,
উগ্রকামগন্ধময়ী সখি,—
তবে কি তুমি মেনেছো হাব নিজে?

তবে কি তুমি ছাতিমদেহ ধরে
আলিঙ্গনে জড়াতে চাও মোরে?
সুরভিকাম আকুল ক্রন্দনে
আবার বুঝি যাচিলে বন্ধনে?
সেইতো ভালো, বাঁধোগো ফুলডোরে।

সপ্তমীর চাঁদ ও হরিপদ কেরণী

দিনমান রোদ আর ধূলো-মাখা অমসৃণ ছাদে
ছেঁড়া শতরঞ্জি আর শক্ত বালিশ পেতে
শায়িত ক্লান্ত আমি।
'সদাগরী অফিসের হরিপদ কেরাণী'ই বটে।
উপস্থিত তুলনীয় বরবেশী সম্রাটের সাথে।

এ-বিশ্বের ছাদনাতলায়
সন্ধ্যালগ্নে বেজে গেছে শাঁখ ;
আত্মীয় নক্ষত্রকুল
আধো-ঘোমটা-টানা কন্যা সপ্তমীর ঐ চন্দ্রিমাকে
সাত-পাক সেরে
আমার চোখের কাছে তুলে ধরবে পিঁড়ি।
আমি শুভদৃষ্টি সারি!
মাথার উপরে ফেলা চার-খুঁট টান-টান্
আকাশের নীল আচ্ছাদন।
ওগো বধূ! কুশণ্ডিকা শেষে,
তোমাকে আনবো আমি বৌ করে কেরাণীর ঘরে।
এ-ঘর রক্ষণশীল, গুজনের দিনের আলোয়
দেখাশোনা মানা।
এর জন্য অভিমান মিছে!
নিয়ত ক্লান্তদেহে চুপিচুপি আসবোই ছাদে.
সেই ছেঁড়া শতরঞ্জি ; থাকবোই জেনো প্রতীক্ষায়
জোৎস্নামদির পায়
একা-একা সে-সময় এসো।
হরিপদ কেরাণীর অফুরন্ত ভালোবাসা পাবে!

তেইশে বৈশাখ

জেগেছিল লালসা আদিম।
উলঙ্গিনী নারীজঙ্ঘা, হাতছানি গুরুনিতম্বের ;
তাই নিয়ে হানাহানি
হাজার বছর ব্যাপি অরণ্যে গুহায়।
নখদন্তে যুদ্ধশেষে পাশবিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা
অবচেতনায়,
আমি যবে টোপর মাথায়
বিবাহবাসরমুখী, এইদিন তেইশে বৈশাখে !

আমি রথারূঢ়।
প্রত্যন্তের পরাজিত রাজা
যেন তার
রূপসী কন্যার পাণি দেবে নজরানা ;
আমি এক দিগ্বিজয়ী রাণা
এখন বরের বেশে চড়েছি চৌঘুড়ি,
সে-রথের অশ্বক্ষুরে সামন্তের অহংকারধ্বনি।

সিংহ-দরজার কাছে রথ পঁহুছিলে
কানে এলো সুরেলা সানাই,
রাগ মালকোষ।
আদিম অরণ্যদোষ, কামনার সফেন বুদ্বুদ
অথবা সে-মধ্যযুগী রাজন্যসুলভ
অশ্বমেধী অহংকার যুব দেহকোষে,
সহসা নামালো ফণা সানায়ের সুরে !

শুধু মাংসলোভ নয়। আরও অন্য কিছু
এই দেহাতীত।
তা না হলে অকস্মাৎ মালকোষ রাগিনীর মীড়ে,
সে-কোন কান্নার নীড়ে ফিরে যেতে মন
পাখা ঝাপ্‌টায়!
তা না হলে কপালের চন্দনের ফোঁটা
কেন অকস্মাৎ
সুরভিত বিরহের ফোঁটা-ফোঁটা অশ্রুজল হয়ে
কতো জনমেব স্মৃতি করে যে মন্থন?

সতীদেহ স্কন্ধে ধরে এই আমি, একদিন,
আসমুদ্র-হিমাচল তোলপাড় ক'রে
রচেছি একান্ন পীঠ!
তুমি যে আমার সেই হারানো মানসী!
তোমারই সন্ধানে আমি আসি এই তেইশে বৈশাখে
দেহ থেকে দেহান্তরে বারবার খুঁজি যে তোমায়
অরণ্যে, গুহায়, সমতটে,
কভু বা মাধবীকুঞ্জে মধুপের মত্ত গুঞ্জরণে,
নীলাকাশপটে কখনো বা
চন্দ্রমুখী স্নিগ্ধ জোছনায়।
কখনো বা আমি পৃথ্বিরাজ!
আপাদমস্তক সাজ দুর্মদ যোদ্ধার।

মন্ত্র উচ্চারিত হলো। এসো এই ছাদনাতলায়,
তোলো মুখ, লজ্জারাঙা মুখ।
অঙ্গ আর হৃদয়ের মিলন-বিরহ ইতিহাস
লিখে যাক তেইশে বৈশাখ।

অশালীন জোনাকিকে

জোনাকি ! আমায় জ্বালিওনা মিছিমিছি।
একি অশালীন আচরণ তব, ছি-ছি !

সমাজের দিকে পিঠ করে মোরা
বন্ধ করেছি দ্বার,
পৃথিবীর কাছে চেয়েছি ভিক্ষা
আদিম অন্ধকার !
আমরা দুজন করবো কূজন
বিজন অন্তরীণে,
অন্যায় তব অনুপ্রবেশ
হেথা অনুমতি বিনে ;
অভদ্র তব কুতূহলী দীপ,
রতিবিভঙ্গী বিভা,
অন্ধকারকে খুন করে খোঁজো
প্রিয়ার জঙ্ঘা গ্রীবা ?

ছি-ছি-ছি জোনাকি, এ কোন্ কৌতূহল ?
ঘর ছাড়ো, আমি দিয়ে দেবো অর্গল।

বুঝি বাতায়ন আধো-অবারিত,
আমরা অসাবধান !
দূর নভচারী সখী-তারাদের
হেথা আড়িপাতা কান ;

তবু তারা শীল, তোমার মতন
সরাসরি ঘরে ঢুকে
দীপ জ্বেলে জ্বেলে দেখছেনা, হেথা
ন্যস্ত কে কার বুকে।
দেখছেনা, এই ফুলশয্যায়, কার অঙ্গের ব্রীড়া
প্রকাশব্যাকুল কোন্ আগ্নেয়গিরিকে দিচ্ছে পীড়া!
কিংবা মদন ইতিমধ্যেই
দুজনারই দেহে বৃত,
মথিতশয্যা, শ্রান্তমিথুন
আদিম অসংবৃত।
বেহায়া জোনাকি! ঘর ছাড়ো এই বেলা
ভালো লাগেনাকো অশালীন এই খেলা!

যৌবনে ফিরে যেতে

আমি এখান থেকে ছবি দেখছি।

তির্‌তির্ করে কাঁপছে বাঁশপাতা উত্তুরে হাওয়ায়।
বাঁশঝাড়ের পক্ষাঘাতগ্রস্থ খানিকটা অঙ্গ
ঝুলে গেছে ডোবাটার মধ্যে।
কয়েকটা সবুজ-বুক ছোট্ট-দেহ চঞ্চল পাখী
বারবার ঝিলিক্ দিয়ে, চক্রাকারে উড়ছে,
উড়ছে আর বসছে দেখছি
আশেপাশের সবুজ গাছের ঝোপে-ঝাড়ে!
হয়তো জোড়া-জোড়া,
মেয়ে আর পুরুষ, পুরুষ আর মেয়ে।

ডোবার কাল্‌চে জলটা নিথর।
উত্তুরে হাওয়ায় যেটুকু কাঁপন লাগছে জলে, সেটা
জোড়া-জোড়া পাখীদের বেহায়াপনায়
লোলচর্ম স্থবিরের ভ্রূকুঞ্চন, বলা যেতে পারে।

আমি এখান থেকে ছবি দেখছি।
আমার বাগানের ডালিমফুলগুলোকে টিট্‌কারি দিচ্ছে
ও-পাড়ার রাঙা শিমুলফুলগুলো।
এরা লজ্জারাঙা, অবনত,
মাটির দিকে মুখ করে আছে।
ওরা আগুন, উদ্ধত ;
টিট্‌কারি ছুঁড়ছে, শিস্ দিচ্ছে যুবতীদের উদ্দেশে।
ডোবার কালো জলটা নিথর। গম্ভীর।

মাঝখানে এক-ঠ্যাঙা একেশ্বরবাদী বক।
ওপারে অনন্ত নীল...
সামনে জীবন্ত কাকলিমুখর সবুজ।
এদিকে ডোবা, নিথর-স্থবির ;
তার গায়ে হুমড়ি-খেয়ে-পড়া বাঁশঝাড়ের একটা অঙ্গ,
ওরা সবাই, আলাদা-আলাদা ভাবে,
কি বাণী শোনাতে চাইছে আমায় ?

কি সুন্দর ! কি সুন্দর !!
পায়ে-চলা আঁকাবাঁকা বিবর্ণ পথের ওপর
এইমাত্র উঠে এলো···
টক্‌টকে লাল-পাড়, শপ্‌শপে, এ কোন যুবতী !
কাদের বাড়ীর বৌ কে জানে !
না, জেনে কাজ নেই বৌটারও,
কে-এক পুরুষ তার দোতলার চিলে-কোঠা থেকে
শকুন-দুচোখ মেলে কি দৃশ্য করে আস্বাদন।
ঠমক্ ঠমক্ গতি গুরুনিতম্বের।
কাঁকের খাপেতে আঁটা কলসির জল
চল্‌কে উঠুক !

কি দরকার ছন্দপতনের ?
এপারের ডোবাটা গম্ভীর।
রক্ষণশীল বুড়োর মতো গোমড়া মুখ।
না, যুবতী ওর ঘাটে নামেনি,
নামতে পারে না, কারণ—
ওর জলে ঢেউ নেই, প্রাণ নেই, কিছুই নেই।

ক্ষুদ্র

ছোট ধান, শস্য এক কণা ;
স্বর্গমর্তপাতালের স্নেহধন্য শিশু,
সীতাপুত্র লবকুশ।
আদিগন্ত শস্যক্ষেত্রে করে যায় রামায়ণ গান।
শিশিরবিন্দুর কাছে মানি পরাভব
চোখ-ঝল্‌সানো সূর্য
তৃণাদপি সুনীচ বৈষ্ণব !
গোষ্পদ,—ক্ষুদ্র পরিমিত।
সেখানে অবাধে দেখি অন্তহীন আকাশ বিম্বিত।
তাই দেখে দেখে
এই আমি দেহটার মুঞ্জতৃণ থেকে
খুঁজে মরি কোথায় ইষিকা !
কোন্ ক্ষুদ্রে মহিমা মহান !
কোন্ নক্ষত্রকে বুকে যত্নে ঢেকে রেখেছে ঝিনুক.
এ-মন চিনুক !

গরুর গাড়ী

নিশুতি রাতের
হিমহিম হেমন্তের মেঠো অন্ধকারে
অনলস চলেছে অনস্
চলেছে— —, চলেছে— —,
হেমন্তলক্ষ্মীর বাহন ঐ জীর্ণ গরুর গাড়ীটা চলেছে
অত্যন্ত শ্লথ শম্বুক গতিতে।
যেন অনন্ত পদযাত্রা।
ছায়া-ছায়া ইতিহাস
যেন সাত বছরের শিশু হয়ে, চালক সেজে
পা ঝুলিয়ে বসে আছে গাড়ীটার সামনে ;
তার চোখের পাতায় তন্দ্রার বিলি-কাটা বঞ্চনা,
গায়ে শতছিন্ন কাঁথা,—
ও যেন চিরকাল এমনি চালক হয়ে
যথাসম্ভব জিরেন দেবে হাড়ে-পাঁজরে ভাঁজ-করা
ওর ভূখা আব্বাজানকে,
যে এখন থুত্‌নি-হাঁটু এক করে
কাশছে— —আর তামুক টানছে
তামুক টানছে— —, আর একটানা কাশছে— —
কাশছে অনন্তকাল ধরে
পিছিয়ে-পড়া কালের পথে বসে।

সূয্যিওঠার আগেই
কন্যাস্নেহে-গড়ে-তোলা হেমন্তলক্ষ্মীকে
পৌঁছে দিতে হবে মঘবন্ জোত্‌দারের আঙিনায়।

ইরফানের কাশিতে
অথবা গরুর গাড়ীর আদিম চাকার শুষ্ক তৃষ্ণার্তকণ্ঠে
ঐ যে ধ্বনি,
না, নালিশ নয়, প্রতিবাদ নয়,
আক্ষেপ নয়, আর্তনাদ নয়......
সচ্ছল শহুরে মানুষের বাতায়নের নীচে এসে
মক্তবের পুরোনো সতীর্থের কণ্ঠস্বর যেন

—বন্ধু ! তুমি জেগে আছো নাকি ?

শ্যাম অঙ্গে ডুরে-কাটা শাড়ী

আমি চিত্রকর। তুলিটার অহংকার
এইমাত্র কে একজন চূর্ণ করে গেল,
নীল আকাশের পটে সাতরঙ রামধনু এঁকে।
আমার বিস্ময়ভাব দেখে আকাশ হাসলো খুব।
"সকালের সূর্য দেখেছো কি ?
দেখেছো কি সূর্য সায়াহ্নের ?
জন্ম ও মৃত্যুর হাতে একই তুলি, একই রংদানি
চিত্রশিল্পী দু'জনই সমান।
আমি এক পট মাত্র। নামটা আকাশ।
এখানে জীবন ছবি আঁকে !
পরিণত শিল্পবোধ। সাতরঙ-রামধনু-অঙ্কনপটু।
ওদিকে তাকাও !"
তাকালাম।
নিষ্পত্র শিমুলতরু ধূসর পাণ্ডুর।
শীর্ণবাহু শিমুলের ঊর্ধে মেলা শাখায় শাখায়
স্বর্ণমুষ্টি ; লাল লাল ফুল।
লজ্জা দিলো তুলিকে আমার।
শিমুলশাখারা দিলো আকাশেরই মতন উত্তর।
তারাও হেসেই খুন। বলে :
"চোখ মেলে দেখেছো কি ?
ঘাসে ফুলে মথ কিংবা পাখীর ডানায়,
সব ছবি রঙে-রসে টইটই কানায় কানায়,
এমন কি, উপেক্ষিতা অঙ্গনের লক্ষ্মীটি তোমার
আহা ! তার শ্যাম অঙ্গ জুড়ে
লুটোপুটি ডুরে-কাটা শাড়ী দেখেছো কি ?
সাতরঙ রামধনু যেন ! ওখানে জীবন ছবি আঁকে।

চৈত্রের ঝড়ে

রোদে-দেওয়া ছেঁড়া শাড়ীটা বৌয়ের
উড়ে গিয়ে ঝোড়ো হাওয়াতে,
চৈতী ঝড়ের সংকীর্তনে লাগালো ধুলোট দাওয়াতে

ধুলো মাখামাখি ; তবু লাফ দিয়ে
শাড়ীটা বাঁচাতে যাই না :
জানি না মনের কি যে হলো ছাই,
ঝুটা প্রশংসা চাই না।
কলাগাছে-গাছে পাতা চৌচির
বনের পাখীরা ত্রস্ত।
আমার মাথার কাঁচা-পাকা চুল
তারাও অবিন্যস্ত।
দুরন্ত হাওয়া একি উদ্দাম !
ঝরে যায় বোল, কচি-কচি আম,
মনে পড়ে যায় সেই কৈশোরে
আমবনে উদয়াস্ত !
বাউরী মেয়েটা আচারের লোভে
পিছুপিছু ছুটে আস্‌তো।
খেলা হয়ে গেছে অবীরগুলাল
ফুলে ফুলে লাল ফাগুনে,
মেলা ভেঙে গেছে গাঙশালিকের
শিমুলফুলের আগুনে।
ফেটে ফেটে গিয়ে পাকা ফলগুলো
আকাশে ছড়িয়ে অসংখ্য তুলো

বলছে ঃ এবার পাড়ি জমাবার
ক'টা দিন বাকি যা গুণে !

এই ঝোড়ো হাওয়া উপভোগ করে
সেই কালামুখো পাখীটা
লুকোচুরি খেলে কোন ঝোপে বসে !
মোর বিরহের বাকিটা
তুলছে জাগিয়ে ; বুকের পাঁজরা
দেখছি বাজিয়ে কতোটা ঝাঁঝরা !
বাউরী মেয়েকে মনে পড়ে কিনা,
জলে ভরে কি না আঁখিটা !
কুহু-কুহু-কুহু দ্রুত লয়ে ডাকে
ডাকাতিয়া কালো পাখীটা।

বিরহ আমার জেগেছে সত্যি,
যাবোনা অফিস যাবোনা।
ছিন্নশাড়ীর এমন ধুলোট
সেখানে দেখতে পাবোনা !
হৃদয়ে লেগেছে চৈত্রের আঁচ,
বুঝি সোনা হয়ে গেল ঘষা কাঁচ !
আর নয় বাঁধা অন্ন-খাঁচায়,
এবার অন্য ভাবনা !

আমার ঘরণী

তোমার মসৃণ মুখ, গৃহস্থের নিকানো উঠান ;
তুলসীর মঞ্চ মাঝখানে,
ঝারি থেকে চুঁয়ে-পড়া বিন্দু বিন্দু মমতা সিঞ্চন !
সেখানে সন্ধ্যার দীপ মাঙ্গলিক শিখা প্রতিদিন।

তুমি নও মানচিত্র শুধু।
সাগরবেষ্টিত সত্তা বাণীময় উপমহাদেশ,
পাহাড়ে আছাড় খেয়ে কল্যাণের মেঘেরা নিঃশেষ
স্তনশৃঙ্গ হ'তে নামে পূত জাহ্নবী।
শঙ্খধ্বনি দিয়ে তারে মর্ত্যভূমে আনে ভগীরথ,
কুলুকুলুকুল্ নাদ ; নাব্য স্রোত ; তরণী ভাসাই !

অনন্ত আকাশ যেন তোমার তনিমা।
মাঝে মাঝে কৃষ্ণপক্ষ। ধীরে ধীরে ষোড়শকলায়
নামে পূর্ণিমা।
তখন বিশ্বাস জাগে,
আমার এ সংসার লুম্বিনীকানন।
অথবা তা' নবদ্বীপধাম।
বুদ্ধ কিংবা গৌরাঙ্গসম্ভব।
সবুজে সবুজ তুমি। ধান্যশীর্ষে আদিগন্ত সোনা,
তুমি অন্নপূর্ণা, আনো অফুরন্ত নবান্নের বাণী।
আমি ভিক্ষু মহাদেব তব অন্নকূটে
দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। শুধু ভিক্ষা মাগি।
এই বুকে বুক রেখে যবে নাও আবেশে নিঃশ্বাস
অটুট বিশ্বাস জাগে পুনর্জন্মবাদে ;

আমি ক্ষ্যাপা মহেশ্বর
ঐ দেহ স্কন্ধে নিয়ে ত্রিভূবন করি তোলপাড় ;
আমি শুনি শপথ সতীর ঃ
"আবার আসবো ফিরে হিমালয়-কন্যারূপে
মেনকার ঘরে।
কভু ভুলিবার নয় শম্ভুবক্ষ সোহাগনিবিড় !"

সুজয়া গুহের শেষ চিঠি

প্রিয়তমেষু,

আমরা লাহুলশৃঙ্গ জয় করেছি !
এবার ফেরার পালা।
মনে হচ্ছে ক-ত-দি-ন ছাড়াছাড়ি,
কতোদিন তোমায় দেখিনি।
জানো, আমায় কিছু অহংকার পেয়ে বসেছে,
একটা শৃঙ্গ জয় করার অহংকার !
অবশ্য তোমার মন জয় করার চেয়েও
অনেক সহজ হয়েছে
এই লাহুলশৃঙ্গ বিজয়।
যদিও, সুজয়া আমার নাম !

এখানে আমার বড় ভালো লাগছে !
সংসার
স্বামী
স্বজন
সকলকেই ভালো লাগতো, ভালো লাগে,
—সত্যি, আমি তাদের এতটুকুও ছোট করছি না ;
কিন্তু, —বিশ্বাস করো—
হিমালয়ের এই সংসারটা আমার আরও
ভালো লাগছে.... .!
রাগ কোরোনা, লক্ষ্মীটি !
তুমিই ত আমায় হিমালয় দেখতে পাঠিয়েছো !
আমি দুচোখ ভরে দেখলাম।

কে যেন আমায় একটা তৃতীয় নয়ন ধার দিয়েছিলো,
আমি সেই তৃতীয় নয়ন দিয়েও দেখলাম !
দেবাদিদেব মহাদেবকে খুঁজতে গিয়ে
দেখা পেলাম উমার !
তুষারমৌলি হিমালয়ের আসনে সমাধিস্থ
ভোলানাথের সঙ্গে
তোমার কোনো প্রভেদ নেই।
কিন্তু, তপস্বিনী উমার সঙ্গে আমার যে অনেক পার্থক্য !
তাই
আমি ভাবছি,
উমার কাছে দীক্ষা নিয়ে তবে ফেরা।
ঐ হিমবাহ............
ঐ কলকল স্রোতস্বিনী কুরচি নদীর নিমন্ত্রণ......
...আমি আসছি.......
আমি ডুব দিয়ে শুদ্ধিস্নান সারবো,
তারপর................
তোমার ধ্যান—ভাঙাবার তপস্যাশেষে
সুজয়া নাম সার্থক করে
শীঘ্রই ফিরবো !

রঙ

নাম তার রানী।
রাজভবনের কাছে, কোনো এক অফিসের
'অনুসন্ধান কেন্দ্রে'র কেরানী।
রাজা নেই, রাজ্য নেই ;
রানীদের তবু দেখা যায় !
মহীতোষের এই কথাই মনে হলো মহিলাকে দেখে :
এতো রূপ তার !
কি যে অনুসন্ধান করতে গিয়েছিল,
ভুলে গেল মহীতোষ।
এতো রূপ যার, তার আবার মেকি সাজ কেন ?
রঙ দিয়ে আরো লাল ঠোঁট
টানা ভুরু আরও পুরু করা
কালোরঙ তুলি টেনে টেনে ?
বলে ফেলে মহীতোষ ঃ এতো বেশী সেজেছেন কেন ?
প্রশ্নটা করেই কিন্তু প্রকৃতিস্থ মহীতোষ
ত্রস্তপদে পালালো কোথায়।

লজ্জায় মিশে গেল রানী।

এমন করে কেউ ত' কখনও প্রশ্ন করেনি তাকে !
ধিক্কারে ধিক্কারে রাণী
খুঁজে পেলো নিজেকে সেদিন।
সত্যি ত ! এতো সাজ কেন ?
জন্মসুন্দরী গোলাপ ত' রঙতুলি নিয়ে
চেষ্টা করেনাকো আরও রূপসী হবার ?

গাঁদারও প্রয়াস নেই কোনো।
সবুজ ধানের ক্ষেত আপনার সবুজে সুন্দর!
লিপ্‌স্টিক রুজ্‌ আর নেল-পালিশের
যতো সব ঝুটো সরঞ্জাম,
টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
ফুলে-ফুলে করণিক রানী, কাঁদলো অনেক।

তারপর
সহজ হলো

সহজ সুন্দর সাজে, যোগ দিল কাজে
রানী পথ চেয়ে থাকে,
কবে সেই উদ্ধত যুবক
আবার আসবে তার অনুসন্ধানে!
দুচোখে বিস্ময় নিয়ে শুধাবে এবার:

রানী! তুমি সাজোনিকো কেন?

পদচিহ্ন

এখন, এই শোকার্ত মুহূর্তে ওকে বাধা দিয়োনাকো
ও এখন' সজল নয়নে
পিতার পায়ের ছাপ তুলে নেয় কাগজের গায়ে।
জ্ঞান-বুদ্ধি তোলা থাক্,
হয়োনা নিষ্ঠুর।
তুলে নিক্ ছাপ। না হয় বাঁধাক্
চন্দন কাঠের ফ্রেমে।
যদিও চন্দনচিতা আর কিছু পরে
ছাই করে দেবে ওর অমর পিতার দেহ-ফ্রেম।

কি সুন্দর ছাপটা উঠেছে
ফাটা-ফাটা রুক্ষ পা-দুটির !

দীর্ঘকাল শহরের পথে-পথে অলিতে গলিতে
নগ্নপদ সন্ন্যাসীর মতো
ক্লান্তিহীন স্বার্থহীন পরিক্রমা তার,
দরিদ্র পীড়িত আর বঞ্চিতের পাশে-পাশে ফেরা !
কার মুখে অন্ন নেই,
বস্ত্র নেই কোন্ অনাথার,
কোন্ ঘরণীর আহা, সর্বনাশ হয়ে গেল,
কেবা করে শব-সৎকার !
এলো মহামারী ? শহরে মড়ক এলো ?
চলো যাই বন্ধ পয়ঃনালী মুক্ত করি স্বেচ্ছাসেবকেরা
অজ্ঞান-তিমিরে অন্ধ নিরক্ষর মানুষেরা ঐ

চেয়ে আছে আমাদের পানে,
চলো যাই, গড়ি পাঠশালা।
এসেছে বৈশাখমাস।
পাপশয্যা পরিহরি প্রভাত-ফেরীর
এই ত সময়! পথে পথে করি নামগান।
তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
জীবপ্রেমী এই মানুষের
ফাটা-ফাটা রুক্ষ পা-দুটোর
কি সুন্দর ছাপটা উঠেছে দ্যাখো!

জীবনের তটপ্রান্তে প্রেমতরঙ্গেরা যত
এঁকে গেছে পলি। ফসলসম্ভব।
মহাজন-পদচিহ্ন ভবিষ্যকে দেখাবে সুপথ।

পুনর্জন্ম

পুনর্জন্মবাদে ঘোর অবিশ্বাস আমার।

কিন্তু,
পড়ন্ত বিকেলে আজ কি যে হয়ে গেল,
আমি নিজেকে চোখ রাঙিয়ে প্রশ্ন করেও
উত্তর পাচ্ছি না।

আমি আমার ছোট্ট বাগানে গিয়েছিলাম।
হাতে খুরপি, সঙ্গে জল দেবার ঝারি।
বাগানের মাটি ঝুরঝুরে ক'রে
ঝারি থেকে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছিলাম শান্তিজল
এমন সময়,
জলের ছিটেয় দুলে-ওঠা ছোট্ট একটা ঘাসফুল
হলুদ-ছোপানো দুষ্টু হাসি হেসে
বিশ্বাস-মাখানো দুঃসাহসিক প্রশ্ন মেলে ধরলো :
—হ্যাগো! তোমায় ত আবার জন্ম নিতে হবে!
তুমি কোন্ ফুল হয়ে জন্মাবে?

প্রতিবাদ দূরের কথা,
হাতের খুরপি হাতেই রইলো,
আমি সম্ভাবনায় বুঁদ :
—সত্যি, আমি কোন ফুল হয়ে জন্ম নেবো?

অসংখ্য ফুলের দল সারি বেঁধে সামনে দাঁড়ালো।

করবী, চামেলি, যুঁই, ডাগর টগর
রূপসী গোলাপ আর গাঁদা...
মনে পড়লো, অনেককাল আগে
আমি গোলাপ হবার ইচ্ছা পুষেছিলাম ;
কিন্তু একদিন,
আমার প্রিয়ার খোঁপায় দুটো গাঁদা ফুলকে ঠাঁই পেতে দেখে,
বাগানের গোলাপকেই বিলাপ করতে শুনেছিলাম ঃ
আহা, এমন সৌভাগ্য হবে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে
আমি যে গাঁদাফুল হয়ে জন্ম নিতাম !

আমি তাই ভাবতে বসেছি ঃ
কোন্ ফুল হয়ে জন্ম নেব ?
গোলাপ, না গাঁদা,

নাকি নামহীন গোত্রহীন তুচ্ছ ঘাসফুল ?

ট্রেনের জানালা দিয়ে

শৈশবের দেশে গিয়েছিলাম।
এবার ফেরার পালা।
পাল্‌কির দোর ফাঁক-করা,
বহুকাল পরে বাপের-বাড়ীতে-ফেরা-মেয়েটার মতো
পঞ্চাশবছরের জানালাটা দিয়ে
উঁকি মেরে দেখি—
ফেলে-আসা দিনগুলো আজও আছে কিনা!

টিবিটিবি পাহাড়ের কোল-ঘেঁষা পায়ে-চলা পথ
এখনও রয়েছে, একি!
আছে নাকি সেই ধূলো?
নারিকেল খেজুরের গাছে গাছে বাচাল চড়ুই'
আলোচ্যবিষয় নয় শৌলমারী আশ্রমের সাধু
আমাদের সে-নেতাজী কিনা!
তবে কি তেমনই আছে ওরা?
ঘামতেলে অঙ্গরাগ-করা বলিষ্ঠ সাঁওতালদল
ফসলসম্ভবা ঐ রোদ-পোহা জমিটায়
নোনা ঘাম আজও ফেলে দেখি!
খবর রাখেনা তারা সিন্‌দ্রী কারখানা
কবে হবে চালু!
তবু মিষ্টি, ফ্রেমে-আঁটা একই ছবি কতো সুমধুর!
আরে? ওকি সেই কুলগাছ? যার নিচে

প্রতিটি পৌষে
চড়ুইভাতির নামে দল বেঁধে এসে
জমায়েৎ হওয়া !
কি মিষ্টি-আক্রোশে যার কাঁটা
বিঁধে দিতো আমাদের লালা-ঝরা লোভে !
ওকি সেই কুলগাছ ?
স্মৃতি এসে এইমাত্র
আঁচড়ে খামচে দিয়ে এই পাঁজরাকে
কি রক্তাক্ত করে গেল মিষ্টি বেদনায়।
জল টলমল দুটি বোজা-চোখ নামালাম ধীরে।

গতিশীল কামরার এ-জানালা দিয়ে
আবার তাকাবো কিনা ভাবছি কেবল।
জীবনের টেলিগ্রাফ-পোষ্ট্টার গায়ে
মাইলের চিহ্নসংখ্যা দেখতে কি হবে ?

ধূপকাঠি

কোলাহলমুখরিত রাজপথ পাশে,
মূর্ত বিষাদ যেন, শতছিন্নবাসে
যে-মেয়েটি থির হয়ে থাকে,
তুমি কি দেখেছো বন্ধু, অভাগিনী সেই বিধবাকে ?

এক হাতে প্রজ্জ্বলিত ধূপ। নিজেরই প্রতীক যেন ;
জানেনা ফেরীর রীতি, ধূপ নেবে ? নেবে ধূপকাঠি ?

হয়তো বা মনে আছে ভয়,
সংকোচ দ্বিধা সংশয়—
ওর মতো অলক্ষণা বিধবার কাছে
কারো যদি মাঙ্গলিক ধূপ নিতে বাধে ?
ও আছে নিজেরই কাছে ছোট হয়ে ঝুটা অপরাধে !

বিসর্পিল ধোঁয়া এতো ছিল নাকি চন্দনের ধূপে !
বিধবাকে পাক দিয়ে পিষে ফেলে ময়াল-বিদ্রুপে ঃ
বলে তারে ডাকি ঃ
হ্যাঁগো ! তুমি চন্দনের গন্ধ চেনো নাকি ?
না হয় সাহারা সিঁথি, মুছে গেছে নববধূসাজ
লবঙ্গের তুলি দিয়ে ললাটের চন্দনের কাজ !
ব্যর্থ তার হয়েছে ফাগুন ;
হোমের আগুন গেছে প্রতারণা করে,
তা বলে কি ওকে ঘিরে অমন বিদ্রুপ
সাজে তোর ? চন্দনের ধূপ !

সমাজ বিগ্রহ এক ; পাথরের নিত্য সন্ধ্যারতি।
ঐ দেহধূপ পুড়ে, ছাই হলে, তবে পরা-গতি।

এপার-ওপার

ওপারে বস্তি,
এপারেতে কোঠাবাড়ী।
এপারের ইঁটে একি অস্বস্তি
ওপারের সাথে আড়ি।
এরা বাবু লোক জানে সুপারিশ।
কাঁচা রাস্তায় পড়লো রাবিশ,
পাথরের কুচি, পিচ।
আর একবার এপার-ওপার লিখলো উচ্চনীচ।
আরও এক ধাপ : ইলেকট্রীকের তার।
গেল অভিশাপ, আলোয় আলোয় রাস্তাটা একাকার
বস্তিবাড়ীর উলঙ্গ ছেলেগুলো
করে হুল্লোড় রাত দশটায়,
এরা কানে দেয় তুলো।
এপার উন্নাসিক :
গিন্নীরা বলে, করপোরেশন ওপারটা তুলে দিক্ !
ওপারের বৌ পাড়াগেঁয়ে এক মেয়ে,
চাদটাকে খোঁজে আকাশের দিকে
বারবার চেয়ে চেয়ে !
হতাশায় শেষে ভাবে,
বরকে বুঝিয়ে বেশী ভাড়া দিয়ে অন্য কোথাও যাবে !

দশ দেবসেনা, এক বণিক

অফিসটার বাড়বাড়ন্ত।
বাণিজ্যলক্ষ্মী আরও ছড়িয়ে গুছিয়ে বসবেন
বণিকের ঘরে। তাই,
সংলগ্ন জমিটাতেও স্কাই-স্ক্রেপার উঠেছে।
স্কাই স্ক্রেপার!
আকাশকে চাঁচবে যে অট্টালিকা।

সারি সারি সুন্দর দেবদারু গাছ ছিল
সংখ্যায় দশ।
উর্ধে আকাশের দিকে
তারাও তুলে ধরেছিল তাদেব ঋজুদেহ
—না, আকাশকে চাঁচবার বা আঁচড়াবার
উদ্ধত আস্ফালন ছিল না তাদের ভঙ্গিমায়।
ছিল বন্দনা।
তারা শুধু পাতা মেলে
সর্বদা সাজিয়ে রাখতো স্বর্গমর্ত্যের তোরণদ্বাব।

সে কি সকরুণ ছবি!
আসুরিক কুঠার আর একরাশ ফাঁসিরজ্জু
দশটি দেবসেনাকেই ধরাশায়ী করলো একের পর এক।
দেবলোক বিপর্যস্ত হলো।
তবু, দেবীচণ্ডিকার বোধন হলো না।
এটা ত' আর সে-যুগ নয়!

পঞ্চাশ বছরের গাছ।   অর্ধশতাব্দীর আশ্রয়।
কতো পুরুষের সবুজ-ভিটে থেকে উদ্বাস্তু হলো
কতো অগণিত পাখী।
ছিটকে ফেটে ছত্রাকার হলো পাখীদের ডিম!
কতো শাবক থেঁত্‌লে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।
চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে
ডানা ঝাপ্‌টে, বুক চাপড়ে, নীড়ভাঙ্গা পাখীর দল
চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিল হাহাকার, আর্তনাদ।
মাটিটা কেঁপে উঠেছিল সে-কান্নায়;
জননী ধরিত্রীর কান্না!
বণিকের আধুনিকযন্ত্রে ধরা পড়েছিল সেই অশুভ কম্পন
তাই,
মাটি যাতে আর না কাঁপে,
ঐ দেবদারুরই দৈর্ঘ্য অনুপাতে
লোহা সিমেন্ট আর বালি মোরামের
বড় বড় থাম তৈরী হলো।

তৈরী হলো মর্ত থেকে পাতালমুখো।

অবসর

আমরা সবাই ছিলাম, অথবা
রয়েছি এখনও কাঁচা,
সঙ্গে চলেছে দেহটার দাবি
দুটো খেয়ে-পরে' বাঁচা।
তাই তো বেছেছি দশটা-পাঁচটা
অফিসের দৃঢ় খাঁচা
বাঁধা মাইনের মিষ্টি নুপুর
দুটো পায়ে বেঁধে নাচা।
নিঃসীম নীল বাইরে আকাশে
মুক্তির হাতছানি।
পাঁজরা-ভরানো অনন্ত বায়ু
বইছে সেখানে জানি,
তবুও সজোরে দরজা ভেজিয়ে
খুঁটে খাই দানাপানি,
ষাটকে ঠেকাই; গোপনে কখন
ঠকে যাই, চোখে ছানি!
আমরা সবাই ছিলাম, অথবা
রয়েছি এখনও যুব।
কখনও আকাশ কখনও বা খাঁচা
হাতছানি দেয় উভ!
দরজাটা খোলা, অবসর এসে
হাঁকছে, লগ্ন শুভ
চলো উড়ে যাই, চিনে নি এবার
যে-তারার নাম ধ্রুব।

যাবো না

এখন, ঠিক এই মূহূর্তে
কে একজন চলে গেল।
চিরদিনের জন্য চলে গেল।
আচ্ছা, আমিও ত যেতে পারতাম!
চুপি চুপি মৃত্যু এসে
নির্মম নিস্পৃহ হাতে হিড়হিড় করে
টেনে তুলে নিয়ে গেল
একটা সম্ভাবনাকে, স্বপ্নকে, সার্থতাকে
অথবা একটা পরিণত সম্ভোগকে ;
একটা ব্যর্থতা, বা হাহাকারকেও বলতে পারো;
নিরর্থক নিষ্প্রয়োজন
হাড়মাংসের একটা কাঠামোকে, বলতে পারো তুমি।
কিন্তু, কিন ? কেন ?
দুনিয়ার বয়ে গেল তোমার ঐ 'কেন'টাকে নিয়ে
মাথা ঘামাবার।
কানাগলির ছাপাখানার ট্রেড্‌ল মেসিন
এখন কোলাহল করে
চিঠি ছাপছে অন্নপ্রাশনের···
কারা যেন মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে
ঘষে ঘষে সাফ করে ঐ, মেঝের চুণের দাগ ;
আর কিছুক্ষণ 'পরে শুভলগ্ন গৃহপ্রবেশের .. ...
আস্তিন-গোটানো ছেলে পরীক্ষার হলে
দুঃসাহসে করছে নকল।

কাঁচের নোলক-পরা আঁটোসাঁটো কাহারের বৌ
যায় ছাখো,—কোমরে ঠমক।
ঠিক এই মুহূর্তে, এখন,
কে একজন চলে গেল তার খোঁজ নেওয়া কি সম্ভব?
আরে দুঃ—র! ভারি দায় পড়েছে ধরার।
আমিই বা ভাবি কেন তবে?
পাত পেড়ে খাওয়া বাকি
ঐ অন্নপ্রাশনের ভোজে।
এখনও হাতের পেশী মরা-মুঠি ছুঁড়ে চায়
দুনিয়াকে জানাতে চ্যালেঞ্জ
আস্তিন গোটানো ঐ যুবকের মতো।
না হয় ঠমক দেখে ঐ বৌটার
যাবো জাহান্নামে আমি তলিয়ে বেবাক।
কেনই বা যাবো ফাঁকি, ভিয়েন যখন
চড়ানো রসের
চন্দ্রেস্যূর্যে আকাশে তারায়
প্রান্তরে, গুহায় আর
গ্রীষ্ম থেকে বসন্তের ঘরে।

আর্জি

ইতিহাস !
আমাকে কি দেবে ঠাঁই তোমার পাতায় ?
এক কোনে, এতটুকু ঠাঁই !
দোহাই তোমার,
কেন দেবে, এ-হেন কঠিন জেরা কোরোনা আমায়।

জামায় কিসের দাগ ?
না, না, ওটা কিছু নয়। সংগ্রামের, সামান্য রক্তের
আমি নই এত্তিলা, সীজর, কিংবা চেঙ্গিজ তৈমুর।
আমার অশ্বের ক্ষুর
অথবা তৃষিত তলোয়ার,
করেনিকো বিশ্ব ছারখার।
করিনি কলিঙ্গ-যুদ্ধ, হবো কি অশোক ·
আমি যে সামান্য লোক,
জীবনকে ভালোবাসলাম।
লিখে নেবে নাম ?

সাগর ধীবর*

ওঠো ভাই, জাগো, ছাড়ো ঘুম !
নিদ্-ভাঙা ও আকাশ ভোরের আলোয় করে স্তব।
সারারাত দাপাদাপি কান্না জুড়েছিল যে-বাতাস
সে-শিশু উষার কোলে ঘুমেতে নিঝুম !
এসো ভাই, তোলো জাল, তীরভূমি থেকে
মুক্ত করো ভেলাগুলো, ঢেউ গেল ডেকে।
আমরা সাগরশিশু, আমাদেরই উত্তরাধিকার,
চলোনা, মুঠোয় আনি যে-সম্পদ ছিটোয় জোয়ার।
আর দেরী নয়, চলো,
সমুদ্রচিলের—স্বরচিহ্নিত পথে চলো যাই ;
মেঘ আমাদের ভাই, ঢেউ সখা, জননী সাগর।
সূর্যাস্তবেলায় যদি টলমল ভেলা, কিবা ভয় !
সমুদ্রদেবতা সেথা ঝড়কে ঝাঁকুনি দেয়
চুল তার মুঠো করে ধরে।
তারই বুকে আছে ঠাঁই : নিরাপদ, নিশ্চিন্ত আশ্রয়।
নারিকেল ছায়াবীথি মধুর মধুর মনোরম আম্রকুঞ্জবন।
পূর্ণিমার জ্যোস্না-ধোয়া ঐ বালুতট
মুখরিত প্রিয়জনকণ্ঠ-কলতানে।
সবই ত মধুর ! তবু, আরও মিষ্টি, আরও সুমধুর
দুরন্ত ফেনার খুশি, আর
দুহাতে ছিটিয়ে-দেওয়া সমুদ্রের জলকণাদের চোখেমুখে চুমা!
টানো দাঁড়, দাও ভেলা ভাসিয়ে এখন ঐ দূরনীলচক্রবালে,
আনত আকাশ আর সমুদ্রের যেথা আলিঙ্গন।

*Sarojini Naidu ; Coromondal Fishers

মাতা নিবেদিতা

তুমি শ্বেতশুভ্র মোমবাতি, মধুবর্তিকা।
দক্ষিণেশ্বরের কেরোসিন কুপির কাছে
দহনের দীক্ষা নিয়ে
অন্ধকারে আলোক ছড়াতে ছড়াতে
তোমার তিলে তিলে আত্মাহুতি !
তোমার বিবেক-বিগলিত জীবনবোধের কানায় কানায়
টলমল অহেতুকী প্রেম ;
ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রু, ভাব-গদগদ।
গলে-গলে ঝরে পড়া
মোম নয়, শুদ্ধা ভক্তিমধু।
তুমি কবে নিঃশেষ,
অথচ তোমার জ্যোতি আজও অনির্বাণ।

কি নামে তোমার পূজা করি ?

দাও, অধিকার দাও, 'মা' বলে ডাকার।

উচ্ছ্বসিত

জীবনটা মূলত উচ্ছ্বাস
শৈশব থেকে শেষ দিন।
যে-ছেলে এখন, 'পেলে'র ছবিটা কেটে কেটে
হোম্‌টাস্কের প্রতি-পাতার খাঁজেতে রাখে
(—আমিও যা করতাম
কার ছবি সাঁটতাম এখন তা মনে পড়েনাতো!)
এরপর কোনো এক সিনেমাশিল্পীর ছবি নিয়ে,
অথবা চকিতে কোনো
ট্রামে-বাসে ক্লাসে কিংবা ট্রেনে দেখা রূপ
সযত্নে শোয়াবে তার কল্পনার মেসবাড়িটার
কাঁঠালের কাঁচা তক্তপোশে
(—আমিও যা করতাম কৈশোরের বেড়া টপ্‌কিয়ে!)
হয়তো বা সে-ছেলেই অকস্মাৎ দুরন্ত বারুদ!
কারণটা অতি তুচ্ছ,
কিংবা দীর্ঘ শতাব্দীর সযত্নলালিত কোনো ঘৃণ্য অবিচার
তারই প্রতিবাদে
নিজেকে নিক্ষিপ্ত ক'রে, বিস্ফোরিত ক'রে আপনাকে
লিখে যায় যৌবনের গান।
—যা আমি করিনি! আমি বসে বসে করি অনুতাপ,
বিলম্বিত সে-এক উচ্ছ্বাস!
উপস্থিত নামাবলী গায়ে।

বাংলার রূপ

পূব বাংলাকে আমি কখনো দেখিনি !
নদী নালা, খাল-বিল,
ধানের-পাটের ক্ষেত,
উদার সবুজমাঠ, মেঘনা-পদ্মা, উদার আকাশ..
চাষাভূষো, মাঝিমাল্লা,
খালেদ মনসুর মিঞা আলি আব্বাস
আমিনা খাতুন আর সাকিনা বিবির মুখ
দেখিনি কখনো !
কোথা থেকে কি যে হলো, ওলট-পালোট ;
চেক্‌পোষ্ট, পাশপোর্ট, ভিসা,
নিষেধের সন্দেহের অলঙ্ঘ্য পাহাড়।
পূব বাংলাকে আর হলোনাকো দেখা।

বহু প্রতীক্ষার পর এইমাত্র, আজ দেখলাম।
এপারে, আমার ঘরে,
সহধর্মিনীর ঐ জলটলমল দু'নয়ন !
না-জানা না-দেখা সেই সাকিনা বিবির শোকে
সে-এখন কান্নায় চুপ !
পূব-পশ্চিম নয়,—গোটা বাংলার রূপ
সেই চোখে প্রতিবিম্বিত !
সেই বাংলার রূপ এইমাত্র জানলাম, যবে
আমার কিশোর ছেলে,—
কণ্ঠে তার একরোখা জিদ্ !
মাকে তার করে তিরস্কার :

কান্না ছাড়ো
রেডিয়োর কাঁটা দিয়ে মহাশূন্য তন্ন তন্ন করে
অনতিবিলম্বে, মাগো ! করো আবিষ্কার
স্বাধীন বেতার থেকে প্রচারিত বাংলার বাণী।

বুক ভরে বাংলার একি রূপ দেখলাম আমি !

আমার চোখের বিষ প্রতিবেশীটার
মেয়েটার নানা দোষ ;
তাকেও দেখছি ঐ কি—আক্ষেপে চুল ছিঁড়ে কাঁদে ঃ
—আহা যদি পারতাম
সীমান্তটা পার হয়ে চলে যেতে রাইফেল কাঁধে।
এপার-ওপার আজ একাকার একই কান্না বুকে।
মরি হায় ! বাংলার একি রূপ দেখলাম আমি !
ওপারে আবালবৃদ্ধ
জাতি-পাতি সব ভুলে
লাখে-লাখে জীবন কবুল।
পদ্মার মেঘনার সব জল হয়ে গেছে পুরাতন, বাসি
ওরা তাই রাশি রাশি
প্রাণ দিয়ে, খুন দিয়ে,
তাজাতাজা রক্তের আনবে জোয়ার ,
সেখানে নতুন ঢেউ আথাল-পাথাল।

পূব বাংলার রূপ কখনো দেখিনি বটে তুই চোখ দিয়ে,
এর বেশী আর কিবা দেখতাম পাশপোর্ট ভিসা সঙ্গে নিয়ে

একটি ঘাসের ঘোষণা

সীমান্ত পার হয়ে ফাঁকা ধূ ধূ মাঠ।
কানে এলো চাপা নিঃশ্বাস।
একি রূপ বাঙলা মায়ের ?
তাজা সবুজের ছোপ্ ছিটানো-ছড়ানো মাঝে মাঝে ,
বাকি সব, সাহারা ? না গোবি ?
সহসা একটি ঘাস, সত্যদ্রষ্টা যেন কোনো কবি,
বলেঃ শোনো !
আর কোনদিন কোনো তৃণ হেথা জন্মাবে না !
এ-রুক্ষতা আমাদেরই পুঞ্জীভূত ঘৃণা !
আহা ! কতো সতী, জায়া ভগিনী কন্যার
বিদীর্ণ জঘনদেশ, রুধিরবন্যার ছাপ...
কি নিষ্ঠুর, কি জঘন্য পাপ !
স্তনমাংসলোভী যৌনশৃগালের বন্য ইতিহাস
মরা ঘাস করুক বহন ; সকরুণ ছবি অসহন !
শুধালাম ঃ তুমি কেন তবে
এমন সজীব তাজা প্রাণবন্ত সবুজ বৈভবে ?
শিশিরাশ্রু-টলমল ঘাস, গভীর নিঃশ্বাস ফেলে।
অথচ উজ্জ্বল-আভা বীর্যকাহিনীর।
দামাল যুবক যত, যোদ্ধা শত মুক্তিবাহিনীর
তাজা দেহ-ঝারি থেকে রক্তের বারি ঢেলে ঢেলে
আমাকে করেছে সিঞ্চন। ধন্য আমি তৃণ অকিঞ্চন।
আমি যে তাদেরই কীর্তি করে যাবো সবুজে ঘোষণা।

তেপান্ন

কুঠিঘাটায়

কি জানি ডাকলো কেন
গঙ্গার এই ঘাট
এই নির্জন তীর, বন্ধ দোকানপাট !
চারিদিক চুপ্‌চুপ্‌
আকাশে তারার ধূপ
হয়ে গেছে অভিষেক,
রাত মহাসম্রাট।
থম্‌থম্‌ নির্জন, এই পারাপার ঘাট।

এ-পারে পাঁচিল বেয়ে উঠেছে পুরাণো বট
বসেছি চরণে তার ছাড়াতে মনের জট !
কেবলই ছলাৎছল
বলছে গাঙের জল :
ঐ ছাখ্‌ ধ্যানে বসে
মৌনী বেলুড়মঠ।
ওপারের ঢেউ লেগে ভেজে এ-পারের তট

জেটিতে নোঙর-ফেলা নৌকারা নিশ্চল।
লণ্ঠন-চোখগুলো প্রজ্ঞায় ঝল্‌মল্‌।
ঐ ইস্পাতপুল
ছুঁয়ে আছে দুই কূল,
মাঝখানে শুধু স্রোত
জীবন ছলাৎছল।
মন কি নোঙর ফেলে এইবার ছোঁবে তল ?

কি হবে গো ভারি করে এই তরী পণ্যে ?
লোলুপ তুহাতে লুটে অপরের অন্নে ?
ইতিহাস হেসে কুটি—
কোথায় সে ডাচ-কুঠি !
ফিরে গেছে কোন্‌কালে
বিদেশিনী কন্যে।
মিছে এ-বণিকপনা তু'দিনের জন্যে।

কানে কানে কথা কয় প্রবুদ্ধ রাত্রি,
পারাপার ঘাটে আর বসে কেন যাত্রি ?
সমুদ্রপথগামী
এই স্রোতে এসো নামি !
পতিতোদ্ধারিণী
জাহ্নবী ধাত্রী
পাবেনা এমন কোল সান্ত্বনাদাত্রী।

রেলগাড়ী

তোমরা কি বিষন্ন ক্লান্ত রেলগাড়ী চড়ে ?
তোলো হাই, গোনো ইষ্টিশন, হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে কখন
গন্তব্যের বুড়ি ছুঁতে পেরে ?
আমি ত বালক হয়ে গেছি !
স্বল্পপাল্লা কোনো এক ইষ্টিশনে ঠেক্ খেয়ে
'নেমে এসো, পৌঁছে গেছি' বলে
অবোধ শিশুকে যেন নামাতে যেয়োনা।
তাহলে এ-আমি আর সহযাত্রি নই, নই, নই।

আমি মানুষের ধারা, বালকের দেহ ধরে
কাল-কালান্তরে দোবো পাড়ি, জীবনের রেলগাড়ী চড়ে।
হাজার-বছর-ব্যাপী সংস্কার বাজাবেই শাঁখ, ইঞ্জিনের মুখে।
বর্তমানে হুঁশিয়ারী বুঝি ?
অথবা সে ইতিহাস দেয় শিটি ভবিষ্যকে ডেকে।
বহুদূ-র দেশে দোবো পাড়ি।
আমি জাতিস্মর।
আমি জানি, চলেছি কোথায়, বাধা নিষেধ না মেনে।
জানালা থাকবে খোলা। এই মন বাইরে উধাও।
কখনো কাঁদবো বসে
(তোমরা ভাববে, আহা ! খোকনের চোখে নিশ্চয়
ইঞ্জিনের কয়লার গুঁড়ো)

আকাশের জন্য কাঁদা,
যদি না আকাশ হয় তেমন সুনীল,
তেপান্তরের মাঠ যদি নয় তেমন সবুজ !

যদি, হাতে বাঁশী
রাখালবালকটাকে দেখতে না পাই,
পদ্ম-শালুক-শোভা পুকুরের পাড় বেয়ে
নাইতে নামেনি, আহা! মা আমার যদি,
যদি খাঁ খাঁ গ্রাম যত
তাহলে আমার জন্য থামাতেই হবে এই গাড়ী।
আমি জাতিস্মর,
বাঁকে বাঁকে হাঁক দিয়ে, গ্রামকে জাগিয়ে
মা-বোনের কোলে চেপে নবান্নের পাত পেড়ে
ফিরবো আবার।

রেললাইনের ধারে ফ্যালফ্যাল-চেয়ে-থাকা
ঘুন্‌সিপরা উলঙ্গ যে-ছেলে,
ও আমার পিঠোপিঠি ভাই!
ওকে আমি তুলে নোবো সহযাত্রি করে।
ও কেন থাকবে পড়ে অনাদৃত হয়ে।
তা বলে কি তুলে নোবো ঐ যে পাখীটা
মাঝে মাঝে দেয় দোল টেলিগ্রাফ্ তারে?
খুশির সবুজ রং গায়ে মেখে উড়ছে উড়ুক!
ঘরের খাঁচাটা থেকে ওকে ত' আমিই ছেড়ে
দিয়েছি আকাশে!
আমি শুধু ওর ঐ মুক্তির সহজ আহ্লাদ
এঁকে দোবো ঘুন্‌সিপরা ছেলেটার গায়!
আমি যে বালক হয়ে গেছি
জীবনের রেলগাড়ী চড়ে!

উত্তরণ

আলোর আভাস-লাগা
পাখী-জাগা প্রথম প্রত্যুষে,
প্রথম আষাঢ়-স্নাত অনাঘ্রাত বেলফুলগুলি,
আমি যে এনেছি তুলি
অঞ্জলি ভরি!
এ-ফুল উৎসর্গ করি কারে?
ঘুমন্ত প্রিয়াকে? নাকি, স্বর্গের সুপ্ত দেবতারে?
বলোনা গো বেলফুল
অঙ্গভরে কি এনেছো, কিবা তার নাম?
শুদ্ধা ভক্তি, অথবা তা' কলুষিত কাম?
শুচিস্মিত হাসি ঠোঁটে, গন্ধভাষ, বলে ফুলদল:
এ-ফুল প্রিয়াকে দাও!
একদিন, কামনার শেষে
হতে পারো বিল্বমঙ্গল!

আমার খোকন

ইমারৎ হবে যেন কার।
স্তূপাকার ইঁট, চূন, বালি।
আমার খোকার খেলা
বালি নিয়ে সারা অঙ্গে মাখা ;
ছোট খেলাঘর গড়া,
নেচে-ওঠা দিয়ে করতালি !

কোটি কোটি বছরের
ইতিহাস-চিক্‌চিক্ ছোট বালুকণারই মতন
আমার খোকন
একদা পাহাড় ছিল।
অনেক শতাব্দী ধরে ঝড়ে-জলে-রোদে
খেলা করে, অবশেষে,
বন্দরে বন্দরে দেয় ধরা
অনেক কণার সাথে।

সভ্যতার ইমারৎ গড়বার সে উপকরণ।

ভারতবর্ষ

ট্রেনে।
থার্ডক্লাশ কামরায় বসে আছি।
সামনের খালি বেঞ্চে
থুড়থুড়ি বুড়ি এক এসে, বসলো হঠাৎ।
যাবে কোন্ দেশে ?
এ যেন ঘাটের মড়া।
অকস্মাৎ ট্যানা গায়ে টেনে
ধুঁকতে ধুঁকতে ট্রেনে উঠেছে। আবার
চলমান জীবনের স্বাদটা পাবার বড়ো সাধ।
চোখের কোটর যেন, কয়লার খাদ !
গলায় তুলসী-কণ্ঠি ;
স্বর্গে পৌঁছে দেবার আশ্বাস টুঁটিটাকে চেপে ধরে আছে ;
অবশ্য, এই সর্তে—
সে যদি একটিবার, এই মর্ত্যে
শ্বাসরুদ্ধ হবার সময়, হরিনাম মুখে নিতে পারে।
—কোথা যাবে ?
আঠা-আঠা বিশুষ্ক থুথুর ভাষায়
দিল সে জবাব : যাবো ত্রিবেণী সঙ্গম।
সেখানে কে আছে ?
কথা বলবার শক্তি বুড়ি আর পেলোনা বোধহয়।
ভাগ্যদেবতার
হিজিবিজি ঢ্যারা-কাটা দুহাতের চেটো, আর
আম্‌সি দুঠোঁট মুড়ে
বুড়ি যা বললো, তার নির্গলিত মানে ঃ

এ-জগতে কেউ তার নেই কোনখানে !
কিছু যে পড়েনি পেটে, জেনেছি, যখন
আমার হাতের
সদ্য-কেনা ঝালমুড়িটার ঠোঙা বাড়িয়ে দিতেই
চিল-ছোঁয়ে কেড়ে নিল বুড়ি।
চিবোতে চিবোতে
তাকালো আমার দিকে।
দৃষ্টিতে নালিশ নেই।
করুণাময়ের প্রতি সেকি ভয়ংকর
কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের চর্বিত-চর্বণ !
—কেউ যদি নেই সেই ত্রিবেণীসঙ্গমে,
কেন মিছে যাওয়া ?
শুধালাম বিরক্তির সুরে।
বাঁচার তাগিদ ভুলে চোয়ালটা চমকে থেমে গেল !
কাঁচ-চোখদুটো যেন আরসি তখন !
কোন এক প্রশান্তির প্রতিবিম্ব সেথা।
আশ্চর্য আগ্রহে হেসে
জিভ নেড়ে ঠোঁট দুটো চেটে,
যা জানালো, তার অর্থ বুঝি :
সেখানে মরণ হলে আর জন্ম হবে না বুড়ির।

নির্লেপ

আমার উঠোনে বাঁধা পক্ষীরাজ, চন্‌মনে তাজা।
সে আমার বড় অনুগত !
যখনই হাঁফিয়ে উঠি কানাগলিটার মতো
এই সংসারে
পক্ষীরাজ ঘোড়াটাকে ডাকি,
কেশরেতে বিলি কেটে বলি তাকে ঃ নিয়ে যাবি নাকি
কোনো এক নীল দূরদেশে ?
তখনই চঞ্চলক্ষুর, তখনই চঞ্চল তার পাখা ঃ
সেখানে অম্‌নি আঁকা
ছবি এক বিবাগী হওয়ার !
আমি হই দুরন্ত সওয়ার,
যেন এক দিগ্বিজয়ী রাজা !
আমার আপনরাজ্য মেঘলোক আর ইন্দ্রলোক !

আমার ঘাটেতে বাঁধা ময়ূরপঙ্খী এক 'নাও'
তাতে মোর পূর্ণ মালিকানা।
দাঁড়িপাল্লাটা নিয়ে হানাহানি শুরু যবে গঞ্জের হাটে
উৎকট কোলাহল সেকি,
মাঝিমাল্লাকে ডেকে দি আদেশ ঃ নিয়ে চল্‌ দেখি
কোনো এক নীল দূরদেশে !
তখনই প্রস্তুত তারা। অনুগত মাঝিমাল্লাদাঁড়ি
আমাকে নিয়েই পাড়ি
প্রশান্তির নীল মোহনায় !
ময়ূরপঙ্খী 'নাও', আমি বসে দিগ্বিজয়ী রাজা।
আমার আপনরাজ্য আসমুদ্র নীলস্বর্গলোক।

শেষ নেই

মায়া-স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালে টাঙানো
জীর্ণ পঞ্জীখানা,
ফাগুনের পাতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে
কি কথা বলছে যেন ?
বিজ্ঞের মতো তর্জনী তুলে
ছক-কাটা ঘরে বসে,
দেওয়াল-পঞ্জী সাবধান করে বুঝি ঃ
'চৈত্র এসেছে। চৈত্রের মানে জানো ?
আর এক পা তুমি এগিয়ে গিয়েছো
মৃত্যুর কাছাকাছি !'
ভয়ে দুরুদুরু তাই কি তোমার বুক ?
তুমি কি দেখোনি বনানীর শাখে
পাতা-ঝরানোর সুখ ?
ঘাতে-প্রতিঘাতে আমরা বৃদ্ধ পাতা
না হয় গেলাম ঝরে,
কিশলয়ে পথ না হয় দিলাম ছেড়ে !
ভয় কি বন্ধু ! মানুষ রইলো মাটিতে শিকড় গেড়ে

বন্ধু ! ওসব ঝুটা তারিখের সীমা।
শেষ জানেনাকো পৃথিবীর প্রাণসূর্য-পরিক্রমা।

জীবন পাণ্ডুলিপি

মহাকাল মহাগ্রন্থাগারিক। গ্রন্থশালায় তার
আমার জীবন-পাণ্ডুলিপিরও হবে একদিন ঠাঁই।
প্রাত্যহিকের পাতা উলটিয়ে পড়ে দেখি বারবার,
হায়রে! সেথায় স্মরণযোগ্য কিছুই ত লেখা নাই!
পিছনের পাতা ছিন্ন করার নেই ত' সম্ভাবনা,
কোন হাত নেই অতীতের লেখা মুছি!
বাঁধা রইলাম প্রতিটি পাতায়, প্রতি অক্ষরে বোনা
এলোমেলো যত অসংলগ্ন রুচি।
অনুশোচনায় লজ্জায় মাথা নিচু!
লেখা হয় নাই পাণ্ডুলিপিতে স্মরণযোগ্য কিছু,
লিখিনি ললিত মধুপদাবলী রসঘন অনুভূতি,
এমনই জীবন-পুঁথি!
কি ছবি এঁকেছি এহেন জীবনপটে?
খেয়ালখুশির বর্ণবিলাস ঘটেছে অনেক বটে
শিল্পীমানস কোথাও ত' ফোটে নাই!
লিখেছি শুধুই সাল ও তারিখ জীবনের পাতা ভরে
লাভ-লোকসান তারই খতিয়ান স্বার্থের অক্ষরে।
জীবনকে নিয়ে দিনযাপনের খেলা,
দেহধারণের নগ্ন তাগিদে শ্বাস নেওয়া আর ফেলা।
মরি লজ্জায়, আগামী দিনের যদি কোনো উৎসাহী
খোঁজে তত্ত্বের সোনা,
এমন পাণ্ডুলিপির পাতায় বিস্ময়ে রবে চাহি,
থেমে যাবে গবেষণা।
এখনও পুঁথির কিছু পাতা আছে বাকি,
প্রেমের আখরে হৃদয়ের কথা এই বেলা লিখে রাখি।

অপ্রকৃতিস্থ মানুষকে

এইমাত্র সূর্যোদয়।
আমি তার টক্‌টকে লাল জবাকুসুমসংকাশং
মহাদ্যুতি অর্চনার স্তোত্রপাঠ সেরে
জানালাম সশ্রদ্ধ প্রণাম।
অবাক বিস্ময়!
ঋষির কিরণকর উত্থিত হলোনা কেন
আশীর্ব্বাদের সেই স্নিগ্ধমহিমায়?

অপ্রসন্ন পিতা?

এই আমি দেখলাম
পরনেতে গাঢ় লাল বেনারসী শাড়ি
বাসর জাগার পর নবপরিণীতা
আশ্চর্য খুশির ঢেউ অঙ্গে তুলে দাঁড়ালো অঙ্গনে।
আমি তার শাড়িটার টক্‌টকে গাঢ় রং দেখে
প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
লাল বেনারসী শাড়ি
যুবতীব অঙ্গে দেয় আগামী দিনের সেই সন্তানসম্ভবা
জননীর অহংকার আভা।
অপার বিস্ময়!
সমগ্র শাড়িটা যেন
আমার প্রশংসাঘন চাহনিকে জানালো ধিক্কার :

অপ্রসন্না মাতা?

এইমাত্র প্রস্ফুটিত একটি গোলাপ।
পক্কবিম্ব অধরের লালমদিরায়
আকণ্ঠ ভেজাবে বলে, তৃষিত যৌবন
করে নিবেদন তার কামঘন নিবিড় চুম্বন।
অবাক বিস্ময়!
সহসা ফেরানো দেখি গোলাপের মুখখানি
তীব্র ঘৃণাভরে।

অপ্রসন্না বধূ?

পিতা মাতা বধূ আর প্রকৃতির পক্ষ থেকে
গোলাপের কাঁটা দিল তীক্ষ্ণশ্লেষ কঠিন উত্তর :
তোমার সমাজ লাল বিদ্বেষে ঘৃণায়!
দুটি হাত লালে লাল মানুষের রক্ত মেখে মেখে!
তোমার প্রশস্তি লাল রক্তেরই নেশাঘোর কিনা
নিতান্ত একান্তে বসে নিজেরে শুধাও।
তারপর এসো!

নুলিয়াকে

আমি তোমার সাহায্য চাই, নুলিয়া!
তুমি আমার হাতটা ধরো।

সমুদ্রে প্রচণ্ড ঢেউ। হাজারটা রাক্ষস যেন
বীভৎস গর্জন ক'রে তেড়ে আসছে আমার দিকে।
তাদের কষ বেয়ে আগ্রাসী ক্ষুধার ফেনা!
ওরা আমায় গ্রাস করতে আসছে।
তুমি আমার হাতটা ধরো, নুলিয়া!
আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি।

আমি সাঁতার জানি না।
আর, সাঁতার জেনেই বা পরিত্রাণ কোথায়?
ওখানে অথৈ লালসা, উত্তাল কামনা,
অজস্র প্রলোভনের হাতছানি।
গুরুগুরু গর্জন করে তেড়ে আসছে তটপ্রান্তে,
এখুনি আছড়ে পড়বে,
পাক দিয়ে ঘূর্ণি টানে রসাতলে নিয়ে যাবে আমাকে:
রুখে দাঁড়ালেও, শুনেছি, নিস্তার নেই!
ঐ তরঙ্গকে নাকি আত্মস্থ করে নিতে হয়!
অথচ
ঐ আত্মস্থ করার কৌশল আমার জানা নেই,
তাই, তোমার সাহায্য চাইছি নুলিয়া!

তুমি আমার হাতটা ধরো।

হৃদয়-বিষ্ণুপ্রিয়া

ঘুম ভেঙ্গে গেল সহসা রাত্রিশেষে।
দাঁড়ালাম এসে
প্রাঙ্গণে মোর যবে,
আহা ! ছু'নয়ন তিরপিত ভেল হেবি সন্ন্যাসীসম
পূর্ণচন্দ্র,—প্রায়াস্ত দূর নভে।
আমি কি আবার হেরিলাম গোরাচাঁদে ?
সেই চন্দনচর্চিত ভাল, ছুনয়নে প্রেমধারা,
বৃন্দাবন-পথানুগমন সেই—
সেই গোরাচাঁদ, নবঘনরস ভাববিহ্বল গতি ?
হবে, তাই হবে--
নদীয়া-ছুলাল ঘরছাড়া হলো, তাই,
প্রাঙ্গনশচী ছায়া-জোছনায় আথালি-পাথালি কাঁদে।
নিদ টুটে গেছে আর একজনার হেথা।
অবলার নাম ঃ হৃদয়-বিষ্ণুপ্রিয়া।
শেষরাতে ঘুম ভেঙেছে আচম্বিতে,
'কোথা প্রাণনাথ !' পালঙ্কে হাত বুলায়ে কেবলই খোঁজে।
নির্ভরশীলা নিদ গিয়েছিল সুখে,
এখনও চিবুকে
গত নিশিথের শতেক সোহাগ মাখা,
অলকা-তিলকা এখনও শ্রীমুখে আঁকা !
ওগো চাঁদ ! ওগো নিরদয় চাঁদ ! এই যদি ছিল মনে
কেনগো জোছনা-বন্যা বহালে সন্ন্যাস-রজনীতে ?
চিরবিরহিনী হৃদয়-বিষ্ণুপ্রিয়া
যুগ যুগ ধরি দয়িত বিরহে কাঁদে !

ওভারব্রীজে

এখানে গাড়ী বদলাবো।
এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ঐ প্ল্যাটফর্মে যেতে
উঠেছি ওভারব্রীজে।
হঠাৎ আমার চমক লাগলো কি যে,
আমি কি কবে বোঝাবো!
থম্‌কে দাঁড়িয়ে দেখছি দিক্‌চক্রবাল,
লালে লাল গোধূলি আকাশ।
এখন যে অস্ত বেলা।
আমার এতদিনের ঝাপ্‌সাদৃষ্টি
এই প্রথম আদিগন্ত প্রসারিত!
সামনে রেল-ইয়ার্ড।
নানা-মত নানা-পথের মতো
কিল্‌বিল্‌-করা অনেকগুলো জটিল সর্পিল রেললাইন
ঐ দূ - - রে
ডিসট্যান্ট সিগনালের কাছ বরাবর গিয়ে
মিশে গেছে একটা লক্ষ্যে।
সেখান থেকে লাইনটা সোজা, ঋজু, বলিষ্ঠ।
গাড়ী বদল করলে
ঐ ঋজু, সোজা, বলিষ্ঠ লাইন ধরেই আমার যাত্রা।

এই ওভারব্রীজে উঠে
আমার দৃষ্টি কোথাও ঠেক খাচ্ছে না।

এখানের আকাশে
কুণ্ডলী-পাকানো ইঞ্জিনের ধোঁয়া,
সেটা ভেদ করে আমার দৃষ্টি
স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণশীল···
খাল, বিল, মাঠ, কাশবন, তালপুকুর,
বকের পাতি, বর্ণাঢ্য মেঘ
···কোন্ এক দিগন্তে পৃথিবী আর আকাশ
মিলে মিশে একাকার !
এই প্রথম আমি দেখলাম
আকাশ কতো বিস্তীর্ণ, পৃথিবী কতো সুন্দর
পৃথিবী কতো বিশাল, আকাশ কতো সুন্দর
এই প্রথম আমি দেখলাম :
মানুষ আয়তনে কতো ছোট
কিন্তু মানুষও কতো বিস্তীর্ণ ও সুন্দর !
আমি গাড়ী বদলাবো বলে উপরে উঠেছি ;
আমি উপরে উঠেছি, তাই
নিচের জগৎ
পাশের জগৎ
উপরের আর দূরের জগৎ
একাকার হয়ে আমার চোখে ধরা দিয়েছে ;

আমি : আমার দেশ

আপনার নাম ?
বহুবার এ-প্রশ্নের উত্তর দিলাম জনে-জনে।
আদিতে বিনয়নম্র 'শ্রী' সংযোজনে
হয়নিকো ভুল কোনদিন।
পুরুষানুক্রমে-পাওয়া যে-উপাধি মাঝে
সাহঙ্কার বংশ-পরিচয়,
তাহার উল্লেখ করি নাম বলা করিয়াছি শেষ

আপনার দেশ ?
জনে-জনে এ-প্রশ্নের দিয়েছি উত্তর
কতো নিষ্ঠা লয়ে।
অমুক জেলার সেই অমুক যে-রেল ষ্টিশন,
সেথা হতে পাঁচ ক্রোশ দূরে
জল্‌জলা নদী বাঁক ঘুরে, অমুক যে গ্রাম !
—সাত পুরুষের ভিটে, সেই হলো দেশ !

একই প্রশ্ন : কিবা নাম ? দেশ কোন্ গ্রামে ?
আজ কিন্তু ডেকে আনে নূতন উত্তর।
তুচ্ছ নাম-গোত্র নয়, নয় ভূয়া উপাধি—গৌরব,
আমি আজ সীমাবদ্ধ আমি শুধু নই—

আরও বড়, মহত্তর কিছু।
অনন্তকালের আমি ; প্রাণসমুদ্রের পানে চিরবহমান
গতিশীল ধরা এক।   মানুষ আমার নাম।
জগতের মানচিত্রে তুচ্ছ বিন্দুসম
ক্ষুদ্র কোনো গ্রাম, কোনো দেশ,
কাল্পনিক রেখা আঁকা জেলা তালুকের সীমা পরিক্রমা শেষে
খুঁজিয়া পেলাম মোর সেই পুরাতন দেশ
বিশ্বচরাচর যার নাম।

মানুষ আমার নাম।
দেশ, ত্রিভুবন।